উন্নতি

(গল্পগ্রন্থ – কিন্নর দল)

গোকুলদের অবস্থা যে কত শোচনীয়,—তা গ্রামের কেউ জানত না। বুদ্ধিমতী গোকুলের মা নিজেদের দারিদ্র্য লোকচক্ষু থেকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো।কিন্তু এবার শীতকালের দিকে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে আর কোন রকমে ঢেকে রাখা চলে না। গোকুলের মা একদিন সন্ধ্যাবেলা ছেলেকে বল্লে, সত্যি গোকুল, তুই বসে বসে আর কতদিন সংসারটি মাটি করবি? একটু কিছু দ্যাখ একবার!

গোকুল পৈতৃক কোঠাবাড়ির ভাঙা রোয়াকের একপাশে বসে সান্ধ্য চা-পানে নিযুক্ত। অর্থাৎ চটা-ওঠা একটা কলাই-করা বাটিতে সে একপ্রকার ফিকে কটা রংয়ের বিস্বাদ তরল পদার্থ সেবন করছিল—তাতে দুধের ছিটেফোঁটা থাকলেও চিনির বালাই ছিল না। পুরোনোখেজুর-গুড় সংযোগেই গোকুলের প্রাত্যহিক চা-পান নিষ্পন্ন হয়—আজ ওর মা গুড় দিতে নারাজ—ও চাইতে গিয়ে বিমুখ হয়ে এসেছে। মায়ের কথার মধ্যে যুক্তির অভাব ছিল না। বাড়িতে ঠাকুরপুজো আছে, দশমী-দ্বাদশী আছে, এক ভাঁড় খেজুর গুড় এসে সিকি ভাঁড়ে ঠেকেচে—নূতন বছরে এখনও গুড় কেনা হয়নি বা কেনবার পয়সাও নেই—ওইটুকু ফুরিয়ে গেলে তখন চলবে কিসে?

এই গুড়ের ব্যাপার নিয়ে মায়ে-ছেলেয় বচসা চললো সারা সন্ধ্যাবেলা।

গকুল বিয়ে-থাওয়া করেনি, বয়স এই মোটে পঁচিশ বছর, বাপ মারা যাওয়ার পরে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আজ আট-দশ বছর বাড়ি বসে আছে—গরিব বামুনের সহায়—সম্পত্তিহীন ছেলে, কে চাকরি করে দেবে? লেখাপড়ায়ও তেমন কিছু জোর নেই। সংসার অবিশ্যি খুব বড় নয়, সে আর তার মা। গোকুলের বাবা বেঁচে থাকতেই মেয়েটির বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেনবারো বছর বয়সে তাই রক্ষে— নইলে এ বাজারে আর ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া গোকুলের সাধ্যে কুলিয়ে উঠতো না।

গোকুলের মা বল্লে, আমার বুদ্ধি শোন্ গোকুল, চল আমরা কলকাতায় যাই। সেখানে কত লোক কত কি করচে, সেখানে গেলে তোর একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। আমিও তোকে ফেলে থাকতে তো পারবো না। আমিও সঙ্গে যাই। বড় আমবাগানটা বিক্রি করে ফেলি।

এ প্রস্তাব মা আরও কয়েকবার করেচে, কিন্তু গোকুলের গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরেনা।কলকাতা শহরকে সে মনে মনে ভয় করে। অত বড় শহরে তো তার জন্যে চাকরি নিয়ে লোকে বসে আছে! মার যেমন কথা!

আজ কিন্তু মার কথায় তার মনটা উৎসাহিত হয়ে উঠলো।ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখলে হয় একবার। এখানেও তো মাঝে মাঝে অনাহার শুরু হয়েচে আজকাল, সেখানে তার চেয়ে আর কি বেশী কষ্ট হবে? কলকাতায় পয়সা রোজগারের অনেক রকম উপায় আছে সেও শুনেচে বটে।

সারারাত ধরে মা ও ছেলে পরামর্শ করলে। বড় বাগান বিক্রি করলে এখন দর হবে না, বন্ধক রেখে সেই টাকা থেকে প্রথম মাসকয়েক শহরের খরচ চলবে। এখানকার বাড়ি কিছুদিন তালাবন্ধ থাকুক।

অবশেষে কলকাতায় যাওয়াই ধার্য হোল। যদুহরি কুণ্ডু স্থানীয় বাজরের বড় কাপড়ের মহাজন—বাগানখানা পঞ্চাশটি মাত্র টাকায় তার কাছে বন্ধক রাখা হল এবং নির্দিষ্ট দিনে মায়ে-ছেলেয় কলকাতায় রওনা হল। চিৎপুর শোভাবাজারে শঙ্কর মিত্রের লেনে ওদের গ্রামের এক নাপিত থাকতো।বাক্স হাতে ঝুলিয়ে জাত-ব্যবসা করে সে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা রোজগার করতো মাসে। গোকুল খুঁজে খুঁজে তার বাসা বার করলে। একখানা ছোট খোলার ঘর—তাতে সে একা থাকে, নিকটবর্তী হোটেলে একবেলা ডাল-ভাত খায়, একবেলা মুড়ি খেয়ে কাটায়, এই তার অবস্থা। গ্রামের ব্রাহ্মণ-কন্যা তার খোলার ঘরে অতিথি, বন্ধু পরামাণিক শশব্যস্ত হয়ে উঠলো।রান্নার হাঁড়িকুড়ি কিনে নিয়ে এল, আর নিয়ে এল চাল ডাল তরকারি। খোলার ঘরে একখানা ছোট্ট পরচালার নীচে আপাতত রান্নার ব্যবস্থা করা হল।

বঙ্কু বল্লে—মা-ঠাকরুন, রোজ রোজ মরি উড়ে বামুনের রান্না খেয়ে, আজ আমার সৌভাগ্যি যে আপনারা এয়েচেন, মা-ঠাকরুনের পাতের দুটি প্রসাদ খেয়ে বাঁচবো আজ।

গোকুল আর তার মা বন্ধু পরামাণিকের সেই খোলার বাসার পাশেই আর একখানা ছোট খোলার ঘর নিলে। মাসে মাত্র তিনটি টাকা ভাড়া।

গোকুলের মা এখানে এসে অকূল সমুদ্রে পড়ে গিয়েছে—একমাত্র ভরসা বন্ধু পরামাণিক, যে কলকাতার রাস্তাঘাট চেনে—সে যদি কিছু কিনারা করতে পারে এর।

প্রতিদিন দুপুরে আর সন্ধ্যাবেলা নিকটেই কোথা থেকে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসরের আওয়াজআসে। একদিন গোকুলের মা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বন্ধু, এখানে কি কোথাও ঠাকুরবাড়ি আছে নাকি?

বঙ্কু বল্লে, হ্যাঁ মা-ঠাকরুন, পাশেই মিত্তিরবাড়ি, ওরা মস্ত বড়লোক। ওদেরই তো ঠাকুরবাড়ি রয়েছে বাড়িতেই। এই রাসের সময় খুব ধুমধাম হবে—আপনি যাবেন না দেখতে। সবাই যাবে। খুব ভালো বন্দোবস্ত।

রাসের দিন পাড়ার আরও পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে গোকুলের মা মিত্তিরবাড়ি ঠাকুর দেখতে গেল। প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের বাঁধানো মেঝের উপর ঝকঝকে রুপোর বাসনে ভোগ, রুপোর ঘণ্টা, কড়িকাঠ থেকে বড় বড় কাঁচের পরকলাওয়ালা ঝাড়ে ইলেকট্রিক আলো জ্বলচে, ধূপধুনোর গন্ধ বেরিয়ে ঘর আমোদ করেচে, আর নানা রকম ফুলের কি চমৎকার গন্ধ!

গোকুলের মা এমন ঠাকুরবাড়ি, এমন জাঁকজমক কখনো দেখে নি জীবনে, বাড়ির কর্ত্রীঠাকরুন ঠাকুরের এক পাশে বসেছিলেন, লোকে চিনিয়ে দিলে। আশি বছর হয়েচে, এখনও কি ধপধপে গায়ের রং!

আরতি ও কীর্তনাদি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রসাদ বিতরণ ও ব্রাহ্মণ-ভোজন।গোকুলের মা বড় থালায় এক থালা খাবার নিয়ে বাড়ি এল।মা ও ছেলে দুজনেই খুব খুশী,এসব খাবার ফলমূল কখনো পাড়াগাঁয়ে ওরা চোখেও দেখেনি।

গোকুলের মা আরও দু'চারদিন ঠাকুরবাড়ি সন্ধ্যাবেলা কীর্তন শুনতে গেল।

এ কদিন গিন্নীমা ওকে লক্ষ্য করলেন। নূতন মুখ, একে তো আগে কখনো দেখেন নি ঠাকুরবাড়িতে!

কাছে ডেকে বল্লেন—তোমার বাড়ি কোথায় গা? এসো তোমার সঙ্গে আলাপ করি। গোকুলের মা সম্ভ্রমে, সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ভাল কথা বেরোয় না, এত বড় বাড়ির কর্ত্রী নিজে যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইচেন। ও সব পরিচয় দিলে। দেশে দুঃখকষ্টে পড়ে এখানে এসেচে, কাছেই খোলার বাড়িতে থাকে। ছেলেটি চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছে। কে-ই বা চাকরি দেবে, এখানে ও কাউকেই চেনে না!

গিন্নীমা ওর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কইলেন, লোকটি বড় ভালো।বল্লেন—আমাদের ঠাকুরবাড়িতে রাত্তিরের ভোগ ব্রাহ্মণ-বাড়ি দেওয়ার নিয়ম আছে। তুমি বাছা রোজ এসে আরতির পরে ভোগ নিয়ে যেও, আমার বলা রইল। কত রবাহূত, অনাহূত লোক এসে খেয়ে যায়। তুমি আর তোমার ছেলে খেলে আমি খুশী হবো।

সেদিন থেকে গোকুলের মায়ের কপালে যা ঘটতে লাগলো—সে স্বপ্নেও তেমন সৌভাগ্য কখনো কল্পনা করে নি।

মস্ত বড় এক থালা-ভর্তি লুচি, তরকারি, মিষ্টি, ফলমূল—গোকুলের মায়ের বাড়ি নিয়েযাওয়াই কষ্ট। কে কত খায়? বন্ধু নাপিত পর্যন্ত লুচি খেয়ে আর পারে না। রোজ রাত্রে লুচি, রোজ রাত্রে একরাশ ফলমূল, বাদাম পেস্তা ছানা মিষ্টি। বড়লোকের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নৈশভোগের যা-কিছু উপকরণ সকল ওদের বাড়িতে।

মাঘ মাসের দিকে ঠাকুরবাড়ির পুরাতন টহলদার মারা গেল। গিন্নীমা গোকুলের মাকে সে কাজে নিযুক্ত করলেন। মাইনে পাবে সাত টাকা, দু'বেলা ভোগের প্রসাদ পাবে। সকালের ভোগটা খুব জমকালো, উপকরণও বেশী—কিন্তু চারজন ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ভোগটা বিলি করে দেওয়ার প্রথা অনেকদিন থেকে প্রচলিত, গোকুলের মায়ের সুপারিশে গোকুল সেই চারজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের অন্যতম হয়ে দাঁড়ালো।

এছাড়া পূজাপার্বণে, বড় বড় উৎসব উপলক্ষে কাপড়-চোপড়ও পাওয়া যায়—ভোজন-দক্ষিণা থেকে ওঠে।গিন্নীমা গোকুলের মাকে বড় অনুকম্পার চোখে দেখতে আরম্ভ করেচেন, এতে অন্যান্য ঝি-চাকরের চোখ টাটায়।

একদিন গিন্নীমা বল্লেন—হ্যাঁ বাছা, তোমার ছেলে লেখাপড়া জানে কতদূর? গোকুলের মা ভাল জবাব দিতে পারলে না। লেখাপড়া সম্বন্ধে তার খুব স্পষ্ট ধারণা নেই।

গিন্নীমা বল্লেন—ওকে নীচে ম্যানেজারের কাছে একদিন দেখা করতে বলো।যদি মুহুরির কাজ-টাজ করতে পারে, তবে আমি আমার ছেলেকে বলে দোব এখন।

গিন্নীমার সুপারিশে গোকুল পনেরো টাকা মাইনের একটা চাকরি পেয়ে গেল। ওর বাংলা হাতের লেখা খুব ভাল, গ্রামে ওর হাতের লেখার খ্যাতি ছিল।

গোকুলের ইচ্ছা খোলার বাড়িটা বদলায়, মা ওর কিন্তু এতে আপত্তি করলে, বল্লে—বাবা, এই খোলার বাড়িই লক্ষ্মী—এ ছেড়ে কোথাও যাবো না। এ থেকে আরও উন্নতি হবে দেখিস তুই।

হলও তাই। গোকুল পরের বৎসরই বিল-সরকারের পদে উন্নীত হল। এ কাজে উপরি রোজগার খুব, দেনাদারেরা কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে নিজেদের বিলের ওয়াদা দেরিতে ফেরাতো। গোকুল মাসে ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ টাকা অনায়াসে রোজগার করতে পারতো—কিন্তু ও স্টেটের মুখের দিকে চেয়ে কোথাও ঘুষ নিত না। ফলে ওর আমলে টাকা বেশী আদায় হতে লাগলো।ম্যানেজারের নজর পড়ল ওর দিকে।

সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদ খালি হল ইতিমধ্যে। বুড়ো নায়েব নালু মুখুজ্যের চোখের অসুখ হওয়ার দরুন সে পেনসনের দরখাস্ত করলে। এই পদে মাসে একশ-দেড়শ টাকা কমিশন পাওয়া যায় বিভিন্ন মুদী, খাবারওয়ালা, দোকানদারের কাছে। ন্যায্যভাবেই এটা পাওয়া যায়, এতে স্টেটের কোনো অনিষ্ট নেই। এ-কাজে একজন বিশ্বস্ত লোকেরই দরকার বটে।

ম্যানেজার একদিন ওকে ডেকে বল্লেন—গোকুল, সংসার সেরেস্তার নায়েবের কাজের জন্যে তুমি দরখাস্ত করেচ?

ও বল্লে, আজ্ঞে হাঁ বাবু।

ও দিয়েছিল কপাল ঠুকে একখানা দরখাস্ত করে। সেরেস্তার অনেকেই তো করেচে। ম্যানেজার বল্লেন—তুমি কি পারবে? বড্ড হুঁশিয়ারির কাজ, আর বড় খাটুনি।

গোকুল সাহস করে বল্লে—খাটুনির ভয় করিনে হুজুর। আর হুঁশিয়ারির কথা বলচেন, আপনি তো বিল আদায়ের কাজেও দেখেছেন আমায়।

—আচ্ছা তুমি পাঁচশো টাকার একটা হ্যান্ডনোট লিখে দাও স্টেটের নামে। ও কাজে পাঁচশো টাকা ডিপোজিট দিতে হবে তোমায়। তোমার মাইনেথেকে আমরা মাসে মাসে দশ টাকা কেটে নেবো হ্যান্ডনোটের দেনার দরুন। তোমাকে আমি ও পোস্ট দিলাম। মন দিয়ে কাজ কোরো।

গোকুল চোখে ঝাপসা দেখলে। ব্যাপার কি? সে স্বপ্ন দেখছে না তো? পঁচিশ টাকা মাইনের বিল-সরকারি থেকে সে ষাট টাকা মাইনের সংসার সেরেস্তার নায়েবের পদে ঠেলে উঠলোএই এক বছরের মধ্যে—যে পদের উপরি কমিশনের আয় গড়ে মাসে দেড়'শ টাকার কম নয়।

কিন্তু সত্যিই তার পরদিন তাকে ডেকে ম্যানেজার একখানা পাঁচশো টাকার হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে ওকে গিয়ে সংসার সেরেস্তার গদিতে বসতে আদেশ দিলেন।

সেদিন গোকুলের মা ঘটা করে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়ে পাড়ার লোকদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে। লোকজনের ভিড় কমে গেলে, কাছে রমানাথ মণ্ডলের গলির বাঁড়ুজ্যে বাড়ির বড় বৌ গোকুলের মাকে এক পাশে ডেকে বল্লেন—মা, তোমাকে একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমার মেয়ে রমাকে তো দেখেছ তুমি মিত্তিরবাড়িতে ঠাকুরঘরে? তাকে তোমায় নিতে হবে।

গোকুলের মা ভাবলে সে ভুল শুনচে। বাঁড়ুজ্যেদের অবস্থা বেশ ভালই, মেয়েটিও সুন্দরী—কিছুদিন আগেও স্কুলের বাসে উঠে তাকে স্কুলে যেতে দেখা গিয়েছে দিব্যি পুতুলটির মতোসেজেগুজে। আজ বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী আপনা থেকে প্রস্তাব নিয়ে এসেচেন তার সঙ্গে গোকুলের বিয়ের?

সেই মোমের পুতুলের মত সুশ্রী মেয়েটিকে পুত্রবধূ করবার স্বপ্ন দেখতেও তো তার সাহসহয় না।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী খুব হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলেন। একদিন সামাজিকভাবে মেয়ে দেখাও হল। মেয়েকে পছন্দ না করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। বিয়ের প্রায় সব ঠিকঠাক, বাঁড়ুজ্যের বাড়ি থেকে মেয়েরা দল বেঁধে পাত্র দেখতে এল। পাত্র গোকুল বিয়ের ব্যাপারে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে খুশীই ছিল। মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী, তার ওপর ভাল অবস্থাপন্ন ঘরের স্কুলে-পড়া-মেয়ে—পাড়াগাঁয়ের গরিব ঘরের ছেলে গোকুলের পক্ষে স্বপ্নের অতীত ওখানে বিয়ে হওয়া।

গোকুল মাকে বললে, ঠিকুজিখানা তো মা এখানে নেই, বাড়ির বড় কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটাতে জমিজমার কাগজ-পত্তরের সঙ্গে এক বান্ডিলে বাঁধা আছে। আমি সেটা এই শনিবারে গিয়ে রবিবার নিয়ে আসি। অনেক দিন দেশে যাওয়া হয়নি, অমনি বাড়িঘর দেখেও আসা হবে এখন।

শনিবার দুটোয় অফিস ছুটি হতেই গোকুল শেয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে বাড়ি রওনা হল। এসেচে আজ তিন বছর দেশ থেকে, এর মধ্যে আর যাওয়ার অবকাশ ঘটেনি।

সন্ধ্যার কিছু আগে নিজের গাঁয়ে ঢুকতেই হাটতলার চারিদিক থেকে লোকে ওকে ছেঁকে ধরল। আজ শনিবার, গ্রামের হাট, সব লোক আজ সেখানে জড় হয়েচে, শেষ হাটে জিনিসপত্র সস্তা হয় বলে অনেকেই বেলা শেষ করে তবে হাটে আসে।

—আরে গোকুল না? বেঁচে আছিস? আমরা ভাবলাম—

—এতদিন কোথায় ছিলে গোকুল বাবাজি, তোমার মা কোথায় ?

—এই যে গোকুল-দা, কোত্থেকে এ্যাদ্দিন পরে, সব ভালো তো?

নানা অধীর আগ্রহভরা প্রশ্নোত্তরের আদান-প্রদান। গোকুলের বেশভূষা দেখে সবাই বুঝলে ওর নিশ্চয় ভাল চাকরি হয়েছে কলকাতায়। সবাই এই তিন বছরের ইতিহাস শোনবার জন্যে ব্যস্ত।

গোকুল তাদের হাত এড়িয়ে পৈতৃক বাড়ির চাবি খুললে। ঘর-দোর বিশ্রী অপরিষ্কার হয়ে আছে। উঠোনে বন-জঙ্গল গজিয়েচে। জানালা-দরজায় উই ধরেচে, কড়িকাঠে বাদুড় চামচিকের বাসা। পাশের বাড়ির ছোট ছেলেকে ডেকে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন চেয়ে আনলে ওদের বাড়ি থেকে। তক্তাপোশটা থেকে একরাশ চামচিকের নাদি সরিয়ে সেখানে সুটকেসটা রাখলে নামিয়ে।

একটু পরে তিনকড়ি মুখুজ্যের ছেলে প্রমোদ তাকে ডাকতে এলো। প্রমোদের বাড়ি যেতে গোকুলের যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। এরই বোন বীণার সঙ্গে গোকুলের একবার বিয়ের প্রস্তাব হয়েছিল বছরতিনেক আগে, যে বছর ওরা কলকাতায় যায় সে বছর। গোকুল বলেছিল চাকরি না পেয়ে সে বিয়ে করবে না।

বীণার বয়েস এখন হয়েচে ষোল-সতেরো। এখনো তার বিয়ে হয়নি, একথা গোকুল জানে। বীণাকে ছেলেবেলায় সে সঙ্গে করে নিয়ে কত বেড়িয়েচে, কুল পেড়ে দিয়েচে, কত শাসন করেচে, পাঠশালার পড়া বলে দিয়েচে। বাড়ি থেকে যাবার আগে বীণা প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসতো যেত, ওর সঙ্গে গল্প করতো—কেবল বিয়ের প্রস্তাবের পরে তাকে আর বেশী দেখা যেত না।

এতদিন পরে দেশে এসে বীণাদের বাড়ি যাওয়া একটা কর্তব্য বটে, বীণার সঙ্গে দেখাকরাও উচিত। কিন্তু যদি বীণার মা পুরোনো প্রস্তাবটি আবার পাড়েন! এখন তো চাকরি করচে, এখন কোন ওজর থাকবার কথা তো নয়!

অথচ বীণাকে বিয়ে করবারও ইচ্ছা নেই।

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না জানে লেখাপড়া, না জানে গান, না জানে ভালো করে কথা কইতে। অবস্থাও খারাপ ওর বাপের—

রমাকে দেখবার পরে ওর মনে হয়েচে, এমন ধরনের মেয়েকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভ করা একটা সৌভাগ্য। দেখবার মত মেয়ে; তার মায়েরও আন্তরিক ইচ্ছা তার বিয়ে হয় রমার সঙ্গে।

প্রমোদের মা যখন পরদিন সকালে কথাটা পাড়লেন, গোকুল তখন মায়ের কথাটাই বড় করে বললে। তার কোন হাত নেই, আচ্ছা কলকাতায় গিয়ে মাকে জানাবে, পরে কি হয় পত্রে লিখবে।

বীণা বোধ হয় তখন জানালা ধরে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল—ওর কথা শেষ হতেই চলে গেল—কেউ টের পায়নি, কখন যে এসেছিল পাশের ঘরে—কিন্তু গোকুলের চোখ এড়ালোনা।

তারপর যখন ওদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে, তখন বীণার সঙ্গে আবার দেখা হল বাড়ির বাইরের গোয়ালের দরজায়। গরুর দড়ি হাতে বীণা ওদের ছোট্ট বাছুরটা পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে বাঁধচে। পরনে আধময়লা শাড়ি, গাছাকতক কাঁচের চুড়ি হাতে, শ্যামবর্ণ মেয়ে, দেখতে এমন কিছু নয়; ওকে দেখে বীণা লজ্জায় চোখ তুলে যেন ভাল করে চাইতে পারলে না; কারণ তার আগেই বীণা শুনেচে মায়ের মুখে বিয়ের প্রস্তাবটা।

গোকুল দেখলে, যখন দেখা হয়ে পড়লো তখন একটা কথাও না বলাটা ভাল দেখাবে না। বললে—বীণা, ভাল আছিস? ওঃ, বেশ লম্বা হয়ে পড়েচিস যে!

বীণা সলজ্জ মুখে বললে—ভাল আছি—তুমি ভাল আছ গোকুলদা?

—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

—জ্যাঠাইমার শরীর ভাল আছে?

—মায়ের শরীর মন্দ না, তবে সেই বাতের ব্যথা মাঝে মাঝে—

বীণা আর কিছু না বলে গোয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল।

বিকেলের ট্রেনে গোকুল কলকাতায় রওনা হল। চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন বিকালটা, গাড়ির জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে কেবলই বীণার কথা ওর মনে আসচে দেখে ও আশ্চর্য হল। আজ সকালে বীণার সেই দীনমূর্তি—পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে গাছাকতক কাঁচের চুড়ি...

আরও দেখে আশ্চর্য হল—ও ভাবচে বীণার কোথায় বিয়ে হবে, কার ঘরে পড়বে অজ পাড়াগাঁয়ে—এই বয়সে, গোয়াল, গরু, ধানসেদ্ধ, ভাত রাঁধতেই জীবনটা কাটাবে। যখন বাপের পয়সার জোর নেই, জীবনে কিছুই দেখবে না, শুনবে না।

তার চেয়ে যদি ওকে বিয়ে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায়—থিয়েটার, বায়োস্কোপ, লোকজন—মাঝে মাঝে দোতলা বাসে করে কালীঘাট কি দক্ষিণেশ্বর, যা কখনো বীণা দেখেনি—কি খুশীই হবে বীণা! জীবনে কখনো ওর হয়নি...রমা কলকাতার মেয়ে, কত দেখেছে, কত শুনেচে। তাকে আর নতুন কি দেখাবে ও!

কিন্তু সহানুভূতি বা দুঃখ এক জিনিস, আর তা থেকে কাজের প্রেরণা পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য—বিশেষত স্বার্থপর যৌবন চায় যা নাগালের বাইরে তাকে হাতে আঁকড়ে ধরতে, চায় তার রূপ, চায় উন্নতি, ছোট চায় বড়কে আয়ত্ত করার আত্মপ্রসাদ—

গোকুল বীণার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে।